# চিন্তার মরুপ্রান্তর ও ধ্বংসস্তূপ

সাইয়্যেদ কুতুব

---

যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখের ওপর ভর দিয়ে চলে, সে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত; নাকি সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (সূরা মুলক, ৬৭ : ২২)

ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এমন এক সময়ে, যখন পৃথিবীতে ছিল বিভিন্ন বিশ্বাস, দর্শন, পুরাণ, কুসংস্কার, রীতিরেওয়াজ এবং ধ্যানধারণা। এদের মধ্যে সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল, দর্শন-পুরাণ, দ্বীন ও আজগুবি বিশ্বাসের বিচিত্র মিশ্রণ ছিল। মানুষের বিবেক উদভ্রান্তের মতো ছুটছিল কখনো- অস্পষ্টতা আর কখনো অনুমানের পেছনে। মানুষ অন্ধকারে ছুটে বেড়াচ্ছিল অনিশ্চিত। অরাজকতা, দুর্নীতি, দুর্দশা আর জুলুমের চক্রে আটকা পড়েছিল মানবজাতির জীবন। এ জীবন ছিল মানুষের অনুপযুক্ত। এ জীবন ছিল পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

জীবন ছিল মরুপ্রান্তরে উদ্দেশ্যহীন, পথহীন এক পথচলা। যেখানে দিকনির্দেশনা নেই, পথপ্রদর্শক নেই, আলো নেই, নিশ্চয়তা নেই, বিশ্রাম নেই। স্রষ্টা, স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য, মহাবিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক, জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য অর্জনের উপায়, স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক—কোনোকিছুর উত্তরই মানুষের কাছে ছিল না। মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল অসহায় ও আশাহীন। চিন্তার মরুপ্রান্তরে পথ হারানো আর বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্বংসস্তূপের নিচে নিমজ্জিত মানুষের জীবন ও জীবনব্যবস্থা ছিল অন্যায় ও অবিচারে ভরা।

ব্যক্তি, সমাজ, মানবজাতি, মহাবিশ্ব কিংবা জীবনের উদ্দেশ্যের মতো বিষয়গুলো নিয়ে মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আকীদা ঠিক করে নিতে হয়। স্রষ্টার ব্যাপারে রাখতে হয় স্পষ্ট ধারণা। তা না হলে মানুষের বিবেক এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের ব্যাপারে স্থির হতে পারে না। আকীদার ব্যাপারে নিশ্চয়তা অর্জনের জন্য তাকে চিন্তার ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে বের হয়ে আসতে হয়। সব অন্ধকার, বিভ্রান্তি আর বিচ্যুতি পেরিয়ে ধাপে ধাপে খুঁজে নিতে হয় মরুপ্রান্তর থেকে মুক্ত হবার পথ।

পশ্চিমা দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের অধিকাংশই মনে করে—ধর্মবিশ্বাস হলো মধ্যযুগীয় ব্যাপার। একই কথা তোতাপাখির মতো আওড়ে যায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করা প্রাচ্যের লোকেরাও। নিঃসন্দেহে তাদের অবস্থান ভুল। বিশ্বাস বা আকীদার বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে দুটি মৌলিক বাস্তবতার ওপর। দুটোই স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ দুটিই যেকোনো সময় ও যেকোনো স্থানের ক্ষেত্রে সত্য।

প্রথম বাস্তবতা : প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। মানুষ বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলিকণা নয়। মহাজাগতিক কাঠামোতে নিজের স্থান ও ভূমিকা নিয়ে কোনো না কোনো উত্তর তাকে বেছে নিতে হয়। আর এ উত্তরের ভিত্তিতেই সে বাকি সবকিছুর সাথে নিজের সম্পর্ককে বুঝতে শেখে। দিনশেষে মানুষকে এমন কোনোকিছুতে বিশ্বাস করতে হয়, যা চারপাশের মহাবিশ্ব আর মহাবিশ্বের সাথে তার নিজের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে পারে। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে এবং নিজের ভূমিকাকে বুঝতে শেখে তার ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভিত্তিতে। এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আবশ্যকতা। স্থান-কাল ভেদে প্রত্যেক মানুষের জন্য এ কথা সত্য। বিভ্রান্ত মানুষের ঔদ্ধত্য কীভাবে তাকে বিপথগামী করে, এর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে, পরের অধ্যায়গুলোতে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা আসবে।

দ্বিতীয় বাস্তবতা : আকীদা এবং সমাজের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্ক ছেঁড়া যায় না, অন্য যেকোনো বন্ধনের চেয়ে তা শক্তিশালী। এই সম্পর্ক কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, সময় কিংবা স্থানের সাথে যুক্ত নয়। যেকোনো সমাজব্যবস্থা কোনো না কোনো ওয়ার্ল্ডভিউ বা অস্তিত্বের সামগ্রিক ব্যাখ্যার ফসল। অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হলো ওয়ার্ল্ডভিউ। আর ভিত্তি ছাড়া গড়ে ওঠা সমাজমাত্রই কৃত্রিম ও স্বল্পস্থায়ী। যতদিন টিকে থাকবে এমন সমাজব্যবস্থা, মানুষের জীবনে নিয়ে আসবে সীমাহীন দুর্দশা। কারণ তা হবে মানবপ্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। আকীদা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য কাঠামোগত দিক থেকে যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি চিন্তাগত দিক থেকেও। নূহ (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে ঈসা (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলগণ এই সত্যই মানুষকে বুঝিয়েছেন। নবি-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) মানবজাতিকে রবের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন, তুলে ধরেছেন মহাবিশ্বে মানুষের অবস্থান, উদ্দেশ্য ও ভূমিকার সঠিক ব্যাখ্যা। কিন্তু তাঁদের শিক্ষা থেকে বারবার মানুষ বিচ্যুত হয়েছে। কখনো রাজনৈতিক কারণে, কখনো কামনাবাসনা, খেয়ালখুশি অথবা অন্যান্য মানবিক দুর্বলতার কারণে। এভাবে রাসূলগণের প্রচারিত সত্যকে বারবার চাপা দেওয়া হয়েছে মিথ্যে ধ্যানধারণার নিচে। বারবার মানুষ বিচ্যুত হয়েছে সরল পথ থেকে।

বাতিল বিশ্বাস আর দর্শনের চোরাবালিতে নিমজ্জিত, কলুষিত জীবনে অভ্যস্ত লোকেরা সমাজের বিদ্যমান ধ্যানধারণা ও জীবনযাত্রাকে বদলাতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন নতুন বার্তা ও বার্তাবাহকের। যে বার্তা সব ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে অন্ধকার দূর করবে, প্রস্তুত করে দেবে মরুপ্রান্তর থেকে বের হয়ে আসার পথ। যা সত্যকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করবে, বিশুদ্ধ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে তুলে ধরবে আর সঠিক আকীদা ও চিন্তার দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলবে নতুন সমাজ। চিন্তার জগতে জমে যাওয়া আবর্জনাগুলো নিজ থেকে সরানোর সক্ষমতা মানুষের ছিল না। প্রয়োজন ছিল রিসালাত ও রাসূলের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

> আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা (নিজেদের অবিশ্বাসে) অটল থাকবে। (অর্থাৎ) আল্লাহর নিকট হতে একজন রাসূল, যিনি পবিত্র কিতাবসমূহ তিলাওয়াত করে শোনাবেন। (সূরা বাইয়্যিনাহ, ৯৮ : ১-২)

অর্থাৎ মানবজাতির ভুলের চক্র থেকে সরে আসার গুরুত্ব বোঝার অবস্থা তখন ছিল না। চিন্তার আবর্জনাগুলো চিহ্নিত করা ছাড়া বিশ্বাসের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াও ছিল অসম্ভব। মানুষের রিসালাতের প্রয়োজন ছিল, তবে এ প্রয়োজনকে সে নিজে থেকে চিনতে পারছিল না।

যেমনটা আমরা বলেছি—ইসলামের আবির্ভাবের আগে মানুষ জড়িয়ে ছিল বিভিন্ন বাতিল বিশ্বাস, দর্শন, পুরাণ, কুসংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, ভ্রান্ত ধ্যানধারণা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের জালে। এগুলো গেঁথে গিয়েছিল তাদের মন ও মস্তিষ্কে। কলুষিত হয়ে পড়েছিল তাদের বিবেক। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোর মধ্যে প্রবেশ করা বিকৃতি, বিভিন্ন বাতিল ধ্যানধারণার বিভ্রান্তি এবং দর্শন ও পৌত্তলিকতার বিষাক্ত প্রভাবে সত্যকে চিনতে পারছিল না তারা।

বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা। তবে ইসলামের আবির্ভাবের আগে ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টধর্মের ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের কিছু উদাহরণ এবং পৌত্তলিক জাহিলিয়াতের কিছু দিক আমরা এখানে তুলে ধরছি।

ইয়াহূদিধর্ম : ইয়াহূদিধর্ম ছিল বিভিন্ন শিরকি ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত। পাশাপাশি তাদের মধ্যে ছিল জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ঔদ্ধত্য আর তীব্র বর্ণবাদী মনোভাব। মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছে অনেক নবি ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম), যিনি 'ইসরাঈল' নামেও পরিচিত। তাঁর নামানুসারেই ইয়াহূদিদের 'বনী ইসরাঈল' বলা হয়। ইয়া'কূবের পিতা ছিলেন ইসহাক, তাঁর পিতা ইবরাহীম। তাঁদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম) শিক্ষা দিয়েছিলেন বিশুদ্ধ তাওহীদের। তিনি তাঁর দাদা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মিল্লাতের ওপর ছিলেন।

মূসা (আলাইহিস সালাম)-ও সেই একই তাওহীদের শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, পাশাপাশি তিনি এনেছিলেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া শারীআ, বর্তমানের ইয়াহূদি-খ্রিষ্টানদের কাছে যা Mosaic Law বা মূসার বিধিব্যবস্থা নামে পরিচিত। কিন্তু একসময় বনী

ইসরাঈল মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হলো। সময়ের সাথে সাথে তাদের বিচ্যুতি বাড়ল। অধঃপতনের ফলে চিন্তার দিক থেকে একসময় তারা নেমে গেল মূর্তিপূজারীদের পর্যায়ে। তাদের ধর্মীয় কিতাবাদিতে, এমনকি ওল্ড টেস্টামেন্টের ভেতর মহান আল্লাহর ব্যাপারে এমন সব জঘন্য কল্পকাহিনি আর বানোয়াট কথা তারা যুক্ত করল, যেগুলো তাওহীদের শিক্ষার বদলে ওহির আলো বঞ্চিত গ্রীক পৌত্তলিকদের পৌরাণিক গল্পের সাথে বেশি মিলে যায়।

কুরআনের সূত্রে আমরা জানি, ইয়াহূদিদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর সন্তানদের তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন; যা বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ, আলোকিত, পূর্ণাঙ্গ এবং সেই সময়কার শিরকি আকীদা থেকে একেবারেই আলাদা। একইভাবে ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম)-ও তাঁর সন্তানদের সেই বিশুদ্ধ তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

> আর আপনি তাদের কাছে বর্ণনা করুন ইবরাহীমের বৃত্তান্ত। যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা কীসের ইবাদাত করো?' তারা বলল, 'আমরা মূর্তির পূজা করি। সুতরাং আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোকে আঁকড়ে থাকব।'
>
> তিনি বললেন, 'তোমরা যখন আহ্বান করো, তখন তারা তোমাদের আহ্বান শোনে কি?' কিংবা তোমাদের উপকার করে অথবা অপকার?' তারা বলল, 'না; তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরকম করতে দেখেছি।'
>
> ইবরাহীম বললেন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা কীসের পূজা করে যাচ্ছ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা? সৃষ্টিকুলের রব ব্যতীত এরা সবাই তো আমার শত্রু। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান। আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান। রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় আমাকে জীবিত করবেন। আর আমি আশা করি, কিয়ামাতের দিন তিনি আমার দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।
>
> 'হে আমার রব!, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করে নিন। আর আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করুন। আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পুনরুত্থানের দিনে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না, যে দিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।' (সূরা শুআরা, ২৬ : ৬৯-৮৯)
>
> নিজেকে যে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের আদর্শ থেকে বিমুখ হতে পারে? দুনিয়াতে তাকে আমরা মনোনীত করেছি; আর আখিরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম। স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ করুন', তিনি বলেছিলেন, 'আমি সৃষ্টিকুলের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' আর এ বিষয়ে ইবরাহীম ও ইয়া'কূব স্বীয় পুত্রদেরকে অন্তিম উপদেশ দান করে গেছেন—'আমার সন্তানেরা!, আল্লাহ এ দ্বীনকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন; কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'
>
> ইয়া'কূবের যখন মৃত্যু এসেছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? যখন সন্তানদের তিনি বলেছিলেন, 'আমার পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে?' তারা উত্তর দিয়েছিল, 'আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের উপাসনা করব, যিনি অদ্বিতীয় উপাস্য এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।' (সূরা বাকারা, ২ : ১৩০-১৩৩)

কিন্তু বিশুদ্ধ তাওহীদের শিক্ষা থেকে তাঁদের বংশধরেরা সরে গেল। দীর্ঘকাল তারা কাটিয়ে দিলো বিচ্যুতির মাঝে। তারপর মহান আল্লাহ এই শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পাঠালেন নবি মূসাকে (আলাইহিস সালাম)। বনী ইসরাঈলের বিচ্যুতি এবং মূসা (আলাইহিস সালাম) তাদের প্রতি কী নিয়ে এসেছিলেন, তা আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

> আর স্মরণ করো, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে

মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, ‘তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং একে অন্যকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে। আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী। অতঃপর তোমরাই তো তারা, যারা নিজেদেরকে হত্যা করছো এবং তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দিচ্ছ; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছো। আর তারা যদি বন্দি হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করো। অথচ তাদেরকে বের করা তোমাদের জন্য হারাম ছিল।

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আনো এবং কিছু অংশে কুফরি করো? অতএব তোমাদের যারা এমন করো, পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া তাদের আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং কিয়ামাতের দিন তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন শাস্তির মধ্যে, আর তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন। (সূরা বাকারা, ২ : ৮৩-৮৫)

অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে এসেছিলেন সুস্পষ্ট প্রমাণসহ, তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে। বাস্তবিকই তোমরা জালিম।

স্মরণ করো, যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের ওপর উত্তোলন করেছিলাম, (আর বলেছিলাম,) ‘যা দিলাম দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করো এবং শোনো।’ তারা বলেছিল, ‘আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম।’ কুফরির কারণে তাদের অন্তরে গো-বৎস-প্রীতি শিকড় গেড়ে বসেছিল।

বলুন, ‘যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে তোমাদের ঈমান যার নির্দেশ দেয়, তা কত নিকৃষ্ট!’ (সূরা বাকারা, ২ : ৯২-৯৩)

অর্থাৎ মূসা (আলাইহিস সালাম) তাদের সাথে আছেন, এমন অবস্থাতেই বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। মিশরের নারীদের কাছ থেকে পাওয়া অলংকার গলিয়ে সামিরি যে স্বর্ণবাছুর তৈরি করেছিল, তার ইবাদাত শুরু করেছিল বনী ইসরাঈল। ওপরের আয়াতে এই বাছুরের কথাই বলা হচ্ছে। তবে তাদের মধ্যে বিচ্যুতি দেখা দেয় স্বর্ণবাছুরের ঘটনারও আগে। ফিরআউনের কবল থেকে মুক্ত হবার পর বনী ইসরাঈল এমন এক জনপদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যার অধিবাসীরা মূর্তিপূজা করত। তাদের দেখাদেখি ইয়াহূদিরা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বলেছিল ইবাদাতের জন্য একটি মূর্তি বানিয়ে দিতে:

বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা উপস্থিত হলো মূর্তিপূজায় রত এক জাতির কাছে। তারা বলল, ‘হে মূসা! তাদের যেমন উপাস্য আছে, আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা তো এক জাহিল সম্প্রদায়।’ এসব লোক যাতে মত্ত আছে, তা ধ্বংস হয়ে যাবে আর তারা যে সব কাজ করছে, তা সব বাতিল।’ (সূরা আ’রাফ, ৭ : ১৩৮-১৩৯)

ইয়াহূদিদের বিচ্যুতি, মহান আল্লাহর ব্যাপারে ভয়ংকর পথভ্রষ্ট আকীদা এবং তাদের শিরক ও মূর্তিপূজা নিয়ে আলোচনা এসেছে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায়। আল্লাহ বলেছেন,

...ইয়াহূদিরা বলে, ‘উযাইর আল্লাহর পুত্র।’ (সূরা তাওবা, ৯ : ৩০)

আর ইয়াহূদিরা বলে, ‘আল্লাহর হাত রুদ্ধ।’ তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা যা বলে, সে জন্য তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আপনার রবের কাছ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা অবশ্যই তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরি বৃদ্ধি করবে। আর আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, তখনই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়; কিন্তু আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৬৪)

> আল্লাহ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী।' তারা যা বলেছে, -তা এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমরা লিখে রাখব এবং বলব, 'তোমরা উত্তপ্ত আযাব আস্বাদন করো।' (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৮১)
>
> আর স্মরণ করো, যখন তোমরা (বনী ইসরাঈল) বলেছিলে, 'হে মূসা!- আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত আমরা কখনো তোমাকে বিশ্বাস করব না', ফলে তোমাদেরকে বজ্র এসে পাকড়াও করল, যা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে। (সূরা বাকারা, ২ : ৫৫)

ইয়াহূদিদের মধ্যে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব আর ঔদ্ধত্য ছিল তীব্র। তারা মনে করত, আল্লাহ কেবল তাদের নিজস্ব গোত্রীয় দেবতা! এই ইলাহ অ-ইয়াহূদিদের সাথে নৈতিক আচরণের নির্দেশ দেন না। নৈতিক আচরণ, আল্লাহর দেওয়া শারীআর নিয়ম মেনে চলা—এগুলো প্রযোজ্য কেবল ইয়াহূদিদের নিজেদের মধ্যে। অ-ইয়াহূদি কারও ক্ষেত্রে এসব মেনে চলার দরকার নেই। তাদের সাথে যা-ই করা হোক না কেন, এ নিয়ে আল্লাহ ইয়াহূদিদের প্রশ্ন করবেন না! -আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

> আর কিতাবীদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যদি তার নিকট তুমি অঢেল সম্পদ আমানত রাখো, তবুও সে তা তোমার নিকট আদায় করে দেবে এবং তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যদি তুমি তার নিকট এক দীনার আমানত রাখো, তবে সর্বোচ্চ তাগাদা ছাড়া সে তা তোমাকে ফেরত দেবে না। এটি এ কারণে যে, তারা বলে, 'উম্মিদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যে বলে। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৭৫)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে তাদের কিতাবে এমন সব জঘন্য বিষয় তারা ঢুকিয়েছে, যেগুলোর তুলনা চলে কেবল মুশরিক গ্রীকদের পৌরাণিক কল্পকাহিনির সাথে। বুক অফ জেনেসিসের তৃতীয় অধ্যায়ে[1] বলা হচ্ছে,

> তখন সেই মানুষটি (আদম) ও তাঁর স্ত্রী সেই সদাপ্রভু ঈশ্বরের হাঁটার আওয়াজ শুনতে পেলেন, যিনি দিনের পড়ন্ত বেলায় বাগানে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিলেন এবং তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরকে এড়িয়ে বাগানের গাছগুলির আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটিকে ডেকে বললেন, "-তুমি কোথায়?'
>
> "
>
> তিনি উত্তর দিলেন, "-বাগানে আমি তোমার হাঁটার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, আর আমি ভয় পেয়েছিলাম কারণ আমি যে উলঙ্গ; তাই আমি লুকিয়ে পড়েছি।"-
>
> আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, "-কে তোমাকে বলেছে যে তুমি উলঙ্গ? যে গাছের ফল না খাওয়ার আদেশ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, সেই গাছের ফল তুমি কি খেয়েছ?"- (জেনেসিস/আদিপুস্তক, ৩ : ৮-১১)
>
> আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, "-মানুষ এখন ভালোমন্দের জ্ঞান পেয়ে আমাদের একজনের মতো হয়ে গিয়েছে। তাকে এই সুযোগ দেওয়া যাবে না, যেন সে তার হাত বাড়িয়ে আবার জীবনদায়ী গাছের ফল খেয়ে অমর হয়ে যায়।"- তাই সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে এদন (ইডেন) বাগান থেকে নির্বাসিত করে সেই ভূমিতে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যেখান থেকে তাঁকে তুলে আনা হয়েছিল। সেই মানুষটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর- এদন বাগানের পূর্বদিকে তিনি করূবদের (স্বর্গদূত) মোতায়েন করে দিলেন এবং জীবনদায়ী গাছের কাছে পৌঁছানোর পথ রক্ষা করার জন্য ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত এক তলোয়ারও বসিয়ে দিলেন। (জেনেসিস/আদিপুস্তক, 3 : 22-24)

নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওমকে প্লাবনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এই প্লাবনের কারণ সম্পর্কে বুক অফ জেনেসিসে বলা হয়েছে,

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যখন বাড়তে শুরু করল ও তাদের ঔরসে কন্যাসন্তানেরা জন্মাল, তখন ঈশ্বরের ছেলেরা দেখল যে, মানুষের মেয়েরা বেশ সুন্দরী এবং তাদের মধ্যে থেকে তারা নিজেদের পছন্দমতো মেয়েকে বিয়ে করল। তখন সদাপ্রভু বললেন, "আমার আত্মা অনন্তকাল ধরে মানুষের সাথে বিবাদ করবেন না, কারণ তারা নশ্বর; তাদের আয়ু হবে 120 বছর।"

সে যুগে পৃথিবীতে নেফিলীমরা[2] বসবাস করত —এবং পরবর্তীকালেও করত, —যখন ঈশ্বরের ছেলেরা মানুষের মেয়েদের সঙ্গে সহবাস করল এবং তাদের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ করল। তারাই প্রাচীনকালের বীরপুরুষ, বিখ্যাত মানুষ হলো।

সদাপ্রভু দেখলেন পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা কত বেড়ে গিয়েছে এবং তাদের অন্তরের চিন্তাভাবনার প্রত্যেকটি প্রবণতা সবসময় শুধু মন্দই থেকে গেল। পৃথিবীতে মানবজাতিকে তৈরি করেছেন বলে সদাপ্রভু মর্মাহত হলেন এবং তাঁর অন্তর গভীর মর্মবেদনায় ভরে উঠল। তাই সদাপ্রভু বললেন, "যে মানবজাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের —এবং তাদের সাথে সাথে পশুদের, পাখিদের ও সরীসৃপ প্রাণীদেরও —আমি এই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব।, কারণ তাদের তৈরি করেছি বলে আমার অনুতাপ হচ্ছে।" কিন্তু নোহ (নূহ) সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করলেন। (জেনেসিস/আদিপুস্তক 6 : 1-8)

প্লাবনের পর নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধররা কীভাবে বংশবৃদ্ধি করে পৃথিবীকে আবারও মানুষে পরিপূর্ণ করেছিল, এ ব্যাপারে জেনেসিসের ১১তম অধ্যায়ে বলা হচ্ছে,

এমতাবস্থায় সমগ্র জগতে এক ভাষা ও এক সাধারণ বাচনভঙ্গি ছিল। মানুষজন যেমন যেমন পূর্বদিকে সরে গেল, তারা শিনারে এক সমভূমি খুঁজে পেল এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করল।

তারা পরস্পরকে বলল, "এসো, আমরা ইট তৈরি করি ও সেগুলি পুরোদস্তুর আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিই।" তারা পাথরের পরিবর্তে ইট, ও চুনসুরকির পরিবর্তে আলকাতরা ব্যবহার করল। পরে তারা বলল, "এসো, আমরা নিজেদের জন্য গগনস্পর্শী এক মিনার সমেত এক নগর নির্মাণ করি, যেন আমাদের নামডাক হয় ও সমগ্র পৃথিবীতে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে না হয়।"

কিন্তু সদাপ্রভু সেই নগর ও মিনারটি দেখার জন্য নেমে এলেন, যেগুলি সেই মানুষেরা তখন নির্মাণ করছিল। সদাপ্রভু বললেন, "এক ভাষাবাদী মানুষ হয়ে যদি তারা এরকম করতে শুরু করে দেয়, তবে তারা যাই করার পরিকল্পনা করুক না কেন, তা তাদের অসাধ্য হবে না। এসো, আমরা নিচে নেমে যাই ও তাদের ভাষা গুলিয়ে দিই, যেন তারা পরস্পরের কথা বুঝতে না পারে।"

অতএব সদাপ্রভু সেখান থেকে তাদের পৃথিবীর সর্বত্র ইতস্তত ছড়িয়ে দিলেন, আর তারা নগর নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিলো। (জেনেসিস/আদিপুস্তক, 11 : 1-8)

সামুয়েল দ্বিতীয় পুস্তক, অধ্যায় ২৪-এ বলা হচ্ছে,

স্বর্গদূত যখন জেরুশালেম ধ্বংস করার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন, তখন সেই দুর্বিপাকের বিষয়ে সদাপ্রভু দয়ার্দ্র হলেন ও লোকজনকে যিনি যন্ত্রণা দিচ্ছিলেন, সেই স্বর্গদূতকে তিনি বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে! তোমার হাত সরিয়ে নাও।" সদাপ্রভুর দূত তখন যিবূষীয় অরৌণার খামারে ছিলেন। (সামুয়েল দ্বিতীয় পুস্তক, 24 : 16)

খ্রিষ্টধর্ম : খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। খ্রিষ্টবাদের আবির্ভাব হয় এমন এক সময়ে, যখন রোমান সাম্রাজ্য পুরোপুরিভাবে শিরক এবং ভ্রষ্টাচারে ডুবে ছিল। রোমান শাসকগোষ্ঠী প্রথম দিকে খ্রিষ্টবাদকে দমনের চেষ্টা করে। খ্রিষ্টানদের ওপর এসময় চালানো

হয় মারাত্মক অত্যাচার। তবে রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টিন ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। কন্সট্যান্টিন সিংহাসনে বসে ৩০৫ ঈসায়ী সনে। তারপর একসময় রোমান সাম্রাজ্য খ্রিষ্টবাদকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু খ্রিষ্টীয় শিক্ষার ছাঁচে নিজেদের পরিবর্তন করার কোনো ইচ্ছা রোমানদের ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টবাদকে রোমীয় পৌত্তলিকতার অনুবর্তী করা। অ্যামেরিকান ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক জন উইলিয়াম ড্র্যাইপার তার বই History of the Conflict Between Religion and Science (ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতের ইতিহাস)-এ বলছেন,

> নতুন নতুন খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করা লোকেদের নজর ছিল তিনটি জিনিসের দিকে—পদ, ক্ষমতা, লাভ। নিতান্তই বৈষয়িক লোকেরা; ধর্মীয় আদর্শ নিয়ে যারা একেবারেই মাথা ঘামায় না, দলে দলে খ্রিষ্টবাদের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠল। বাহ্যিকভাবে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করলেও অন্তরে তারা ছিল পৌত্তলিক। এদের প্রভাবে দ্রুতই খ্রিষ্টবাদের পৌত্তলিকীকরণ শুরু হলো। সম্রাট নিজেও এদের চেয়ে খুব একটা ভালো ছিল না। খ্রিষ্টবাদের পৌত্তলিকীকরণ প্রক্রিয়াতে সে কোনো বাধা দিলো না। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিলেও চার্চের আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান সম্রাট পালন করা শুরু করে তার কলুষিত জীবনের একদম শেষ দিকে। তার মৃত্যু হয় ৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে।[3]
>
> রোমান সাম্রাজ্যকে নতুন এক কর্তা দেওয়ার মতো ক্ষমতা খ্রিষ্টবাদের ছিল। কিন্তু ছিল না প্রতিদ্বন্দ্বী পৌত্তলিকতাবাদকে ধ্বংস করার মতো ক্ষমতা। এখানেই খ্রিষ্টবাদের সাথে মোহাম্মেদানিসমের (ইসলামের) পার্থক্য। মোহাম্মেদানিসম (ইসলাম) সম্পূর্ণভাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শকে ধ্বংস করেছিল এবং কোনো মিশ্রণ ছাড়া নির্ভেজালভাবে প্রচার করেছিল নিজেদের বিশ্বাস।[4]
>
> সম্রাট কনস্ট্যানটিন ছিল দুনিয়াবি লোক। তার মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা আবেগ ছিল না। তার কাছে মনে হয়েছিল তার জন্য, রোমান সাম্রাজ্যের জন্য এবং খ্রিষ্টবাদ ও পৌত্তলিকতার প্রতিদ্বন্দ্বী দুই আদর্শের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল ছিল এই দুই অবস্থানের যথাসম্ভব একীভূতকরণ বা সংমিশ্রণ। আন্তরিক খ্রিষ্টানরাও এই পলিসির বিরোধিতা করেছিল বলে মনে হয় না। হয়তো তারা ভেবেছিল পৌত্তলিকতা থেকে ধার করা ধ্যানধারণাগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করাটাই খ্রিষ্টবাদের প্রচারের ও প্রসারের জন্য সবচেয়ে ইতিবাচক হবে। শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টবাদের প্রকৃত শিক্ষা টিকে থাকবে, সব অশুদ্ধি আর কলুষতা থেকে তা নিজেকে মুক্ত করে নেবে।[5]

কিন্তু আন্তরিক খ্রিষ্টানরা যেমনটা আশা করেছিল, শেষপর্যন্ত তা হয়নি। খ্রিষ্টবাদ কলুষতা আর অশুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে পারল না। বরং খ্রিষ্টধর্মে পৌত্তলিকতা, পৌরাণিক ধ্যানধারণা, দার্শনিক জল্পনাকল্পনার প্রভাব দিনদিন বেড়ে চলল। -রাজনৈতিক, জাতিগোষ্ঠীগত এবং ফিরকাগত দ্বন্দ্বে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল খ্রিষ্টবাদ। এই সব দ্বন্দ্বের ফলে তাদের মৌলিক আকীদা বিভক্ত হয়ে গেল অসংখ্য অংশে।

এক ফিরকা বলল, 'যিশু খ্রিষ্ট একজন মানুষ কেবল।' আরেক ফিরকা ঘোষণা করল, 'পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা হলেন তিনজন ব্যক্তিসত্তা; যাদের মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি বিরাজিত হন।' তৃতীয় এক ফিরকা বলল, 'পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এরা একই ঈশ্বরের তিনটি রূপ; যা ঈশ্বর মানবজাতির নিকট প্রকাশ করেছেন।'

এই ফিরকার মতে, ঈশ্বর (পিতা) পবিত্র আত্মারূপে মারইয়ামের ওপর অবতরণ করেছেন এবং খ্রিষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর তিনটি ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়ে বিরাজিত—পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। পিতা ঈশ্বর পবিত্র আত্মারূপে কুমারী মারইয়ামের নিকট অবতরণ করেছেন, আর তাঁর (মারইয়াম) থেকে তিনি যিশুরূপে জন্ম নিয়েছেন, যিনি একজন মানুষ।

আরেক ফিরকা বলল, 'পিতার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র চিরন্তন বা চিরস্থায়ী (co-eternal) নয়। যেহেতু তিনি একজন সৃষ্টি, তাঁর অবস্থান পিতার নিচে এবং তিনি পিতার অধীনস্থ।' আরেকদল পবিত্র আত্মাকে ট্রিনিটির অংশ মানতে অস্বীকার করল।

৩২৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় বিখ্যাত কাউন্সিল অফ নাইসিয়া (নাইসিয়ার পরিষদ)। নাইসিয়া পরিষদ এবং ৩৮১-এর কন্সট্যান্টিনোপল কনভোকেশানে অধিকাংশের ভোটে সিদ্ধান্ত হয়,

> ‘ঈশ্বরত্বের ক্ষেত্রে পুত্র ও পবিত্র আত্মা পিতার সমপর্যায়ের। পুত্রের ক্ষেত্রে বলা যায়, পৃথিবী এবং মানবজাতি সৃষ্টিরও পূর্বে তিনি পিতার দ্বারা জন্ম নিয়েছেন। আর পবিত্র আত্মা উদ্ভূত হন পিতা থেকে।’

৫৮৯-এর টলেডো কনভেনশানেও সিদ্ধান্ত হয়, ‘পবিত্র আত্মা উদ্ভূত হন পিতা থেকে।’ এ পর্যায়ে খ্রিষ্টীয় চার্চের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য হলো এবং একসময় তারা আলাদা হয়ে গেল। ল্যাটিন বা পশ্চিমা খ্রিষ্টীয় চার্চের কিছু কিছু ফিরকা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর পাশাপাশি মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর ইবাদাতের দিকেও ঝুঁকল। কারণ ঈসা যদি ঈশ্বর হন তাহলে মারইয়াম ‘ঈশ্বরের মাতা’। এভাবে চলতে থাকল নানা ভাঙন আর নতুন নতুন বিশ্বাসের গঠন। ড. অ্যালফ্রেড বাটলার, তার বই ÷The Arab Conquest of Egypt (আরবদের মিশর বিজয়)-এ বলেছেন :

> (রোমান) সাম্রাজ্যের শেষ দুই শতাব্দীতে রোমান আর মিশরীয়দের মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকত। এই সংঘাত ছিল জাতিগত এবং ধর্মীয়—তবে ধর্মীয় দ্বন্দ্বের প্রভাব ছিল তুলনামূলক বেশি। এই সময়কার সংঘাতের কেন্দ্রে ছিল মনোফিসাইট আর মেলকাইটদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।[6] মেলকাইটরা ছিল ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণির অবস্থানের অনুসারী। যিশু খ্রিষ্টের দ্বৈত প্রকৃতির ব্যাপারে তারা  মূলধারার খ্রিষ্টানদের অভিমতটিই পোষণ করত। কিন্তু মনোফিসাইট কপ্টরা, অর্থাৎ মিশরীয় কিবতি খ্রিষ্টানরা ঘৃণার চোখে দেখত এ অবস্থানকে। এমন উন্মত্ততার সাথে তারা এ অবস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করত, যা গসপেলের অনুসারী দূরে থাক, বোধবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষের কাছ থেকেও প্রত্যাশিত নয়।[7]

মিশরীয় পুরাণে বেশ কয়েকটা ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদের ধারণা ছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল আইসিস, ওসাইরিস এবং হোরাসের ট্রিনিটি।[8] মিশরীয়দের কাছে খ্রিষ্টধর্মের ট্রিনিটির ধারণাকে নিশ্চয় মিশরীয় পুরাণের অনুকরণ মনে হয়েছিল। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ টি ডব্লিউ আর্নল্ড, তার বই The Preaching of Islam-এ লিখেছেন :

> ১০০ বছর আগে সম্রাট জাস্টিনিয়ান বাহ্যত রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে কিছুটা হলেও ঐক্য গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর সাথে সাথে খুব দ্রুতই তা ভেঙে পড়ল। এসময় ক্ষমতার কেন্দ্র আর প্রদেশগুলোর মধ্যে একধরনের জাতীয় ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সম্রাট হেরাক্লিয়াস কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সিরিয়াকে আবারও যুক্ত করার ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু একীভূতকরণের লক্ষ্যে তার গ্রহণ করা পদ্ধতিগুলো শেষ পর্যন্ত বিভেদ আরও বাড়িয়ে দিলো। সেই সময়ে জাতীয় চেতনার একমাত্র বিকল্প ছিল ধর্মীয় আবেগ। হেরাক্লিয়াস ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করতে চাইলেন। তিনি ধর্মের এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপনের চেষ্টা করলেন, যা তর্কবিতর্ক বন্ধ করবে এবং সব পক্ষকে এককভাবে চার্চ ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করবে।
>
> ৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের চ্যালসেডন পরিষদের অবস্থান ছিল—
>
> যিশু খ্রিষ্টকে স্বীকার করতে হবে দুইটি প্রকৃতির সমন্বয় বলে। এদের মাঝে বিশৃঙ্খলা, পরিবর্তন, বিভাজন অথবা বিচ্ছেদ নেই। এই দুই প্রকৃতির মাঝে পার্থক্য কোনোমতেই তাদের (মানবদেহে) একীভূত হবার দ্বারা বিলুপ্ত হয় না। বরং এই প্রত্যেক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ (যিশুর) একই ব্যক্তিসত্তা এবং একই উপাদানের মাঝে যুগপৎ এবং সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে। তা দুই ব্যক্তিসত্তার মাঝে বিভক্ত অথবা পৃথক অবস্থায় নয়; বরং এক ও অভিন্ন পুত্রের মাঝে (বিরাজিত), যিনি (ঈশ্বরের) একজাত এবং যিনি বাক্য-ঈশ্বর।
>
> যিশুর একক প্রকৃতিতে বিশ্বাসীরা বা মনোফিসাইটরা এই অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা যিশুর একটিমাত্র প্রকৃতিকে স্বীকার করত। তাদের মতে, যিশু খ্রিষ্ট ছিলেন একজন ‘যৌগিক’ ব্যক্তিসত্তা, যাঁর মাঝে ঈশ্বর এবং মানব উভয়েরই সকল প্রকার গুণাবলি রয়েছে। উভয়জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে যে ধারণ করেছে, সে আর দ্বৈত অবস্থায় থাকে না বরং এক যৌগিক এককে পরিণত হয়।
>
> মিশর ও সিরিয়াতে মনোফিসাইটরা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এ অঞ্চলগুলোতে বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে অর্থোডক্স এবং মনোফিসাইটদের মধ্যেকার বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব চলল। হেরাক্লিয়াস এ তর্কের অবসান করে সাম্রাজ্যকে একীভূত করতে চাইলেন মনোথেলেটিসম নামের আরেক মতবাদের ভিত্তিতে। তবে যিশুর দ্বৈত প্রকৃতির বিষয়টি তিনি মেনে নিয়েছিলেন। মনোথেলেটিসম একক ব্যক্তির দুই ধরনের কার্যাবলিকে নাকচ করে যিশুর দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিসত্তার একত্বের বিষয়টির স্বীকৃত দেয়। এ অবস্থান অনুযায়ী, ঈশ্বরের পুত্র খ্রিষ্ট একটিমাত্র মানবীয়-ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ায় মানবীয় এবং ঐশ্বরিক কার্যাবলি সম্পাদন করেন। অর্থাৎ অবতারে পরিণত হওয়া (ঈশ্বরের) বাক্যের (যিশুর) একটিমাত্র ইচ্ছা বা একক অভিপ্রায় কাজ করে।[9]

কিন্তু হেরাক্লিয়াসের ওই পরিণতিই হলো, যা আরও অনেক মধ্যস্থতাকারীদের ভাগ্য ঘটেছিল। বিতর্ক ও দ্বন্দের অবসান তো হলোই; বরং তা আরও তীব্র হয়ে উঠল। খোদ হেরাক্লিয়াসকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হলো এবং দুপক্ষই তার ওপর ক্ষেপে গেল।[10]

দ্বীনের ক্ষেত্রে ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টানদের বেশ কিছু বিচ্যুতির কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আহলুল কিতাবকে বারবার আহ্বান করা হয়েছে বিচ্যুতি থেকে বিরত হয়ে বিশ্বাসকে সংশোধন করে নিতে। ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃত শিক্ষা, যা পরে বিকৃত করা হয়েছে, সেটিও কুরআনে উঠে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

অবশ্যই তারা কুফরি করেছে, যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন।' অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। আর তারা যা বলে, তা থেকে বিরত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তাদের ওপর অবশ্যই কষ্টদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। তবে কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মারইয়াম পুত্র ঈসা একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছেন। এবং তার মা ছিলেন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠা। তারা উভয়ে খাদ্য আহার করতেন। দেখুন! -আমরা তাদের জন্য আয়াতগুলোকে কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি; তারপরও দেখুন, কীভাবে তারা (সত্যের) বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে।

বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করবে, যা তোমাদের জন্য কোনো ক্ষতি ও উপকারের ক্ষমতা রাখে না? অথচ একমাত্র আল্লাহই সবকিছু শোনেন ও জানেন।' বলুন, 'হে কিতাবধারীরা! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না এবং আর সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না, যারা ইতঃপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৭৩-৭৭)

ইয়াহূদিরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র।' আর নাসারারা বলে, 'মাসীহ আল্লাহর পুত্র।' এসব তাদের মুখের কথা। এতে তারা তাদের পূর্বেকার কাফিরদের কথারই অনুকরণ করে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! কেমনভাবে তারা সত্য পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে! (সূরা তাওবা, ৯ : ৩০)

আরও স্মরণ করুন, আল্লাহ যখন বলবেন, 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা;! আপনি কি লোকদেরকে বলেছিলেন, "আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আমাকে আর আমার মাতাকে ইলাহ বানিয়ে নাও+?"'

তিনি বলবেন, 'আপনিই মহিমান্বিত! যার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম, তাহলে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে, তা আপনি জানেন; কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো জানেন। আমি তাদেরকে কেবল তা-ই বলেছি, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন—'তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত করো।' এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী;; কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সবকিছুর ওপর সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা মায়িদা, ৫

: ১১৬-১১৮)

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, সময়ের সাথে সাথে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর শিক্ষা থেকে খ্রিষ্টবাদের বিচ্যুতির মাত্রা বেড়েছে। বিচ্যুতির গতি ও মাত্রাকে প্রভাবিত করেছে ঐতিহাসিক নানা ঘটনাপ্রবাহ। এক পর্যায়ে খ্রিষ্টবাদ বিভিন্ন পৌত্তলিক ও পৌরাণিক ধারণা নিজেরা ধারণ করতে শুরু করেছে। ফলে বহু শতাব্দী জুড়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ধর্ম নিয়ে নানা তর্কবিতর্ক, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে জন্ম দিয়েছে যুদ্ধ ও গণহত্যার।

আরববিশ্ব : এবার আমরা তাকাব কুরআন অবতীর্ণ হবার আগে আরব উপদ্বীপের পরিস্থিতির দিকে। সেই সময় আরব উপদ্বীপে বিকৃত ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টধর্মের উপস্থিতি ছিল। আরও ছিল পারস্য থেকে আমদানি করা বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনা আর পৌত্তলিকতার আরবীয় সংস্করণ। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃত দ্বীনের ব্যাপারে আরবরা ছিল একেবারেই বেখবর। এই শিক্ষাকে তারা বিকৃত করে ফেলেছিল ব্যাপকভাবে। নবি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু আরবরা ছিল স্থূল মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত। আরবের এই বিকৃতির কথা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের খণ্ডনও করা হয়েছে।

আরবীয় পৌত্তলিকতার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—কন্যাসন্তানের ব্যাপারে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য। আরবরা কন্যাসন্তান চাইত না। কন্যাসন্তান হওয়াকে তারা ঘৃণা করত। কিন্তু তারাই আবার বলত, 'ফেরেশতাগণ হলেন মহান আল্লাহর কন্যা!' তারা এমন কিছু মূর্তির ইবাদাত করত, যেগুলো তাদের চোখে ছিল ফেরেশতাদের প্রতিমূর্তি। তারা বিশ্বাস করত এই মূর্তিগুলো বা ফেরেশতারা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। তাদের সুপারিশ মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন না। এই সব নোংরা বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে কুরআনে :

> আর তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে কতককে আল্লাহর অংশ মনে করে নিয়েছে। মানুষ অবশ্যই স্পষ্টত অকৃতজ্ঞ।
>
> কী! তিনি তাঁরই সৃষ্টি হতে কন্যাসন্তান গ্রহণ করেছেন আর তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন পুত্রসন্তান? তাদের কাউকে যখন সংবাদ দেওয়া হয় সেই সন্তানের, যা তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে, তখন তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায়, আর মন দুঃখ-বেদনায় ভরে যায়। তারা কি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে এমন সন্তান, যে অলংকারে লালিত পালিত হয়, আর বিতর্ককালে বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে অসমর্থ?
>
> আর রহমানের বান্দা ফেরেশতাগণকে তারা নারী গণ্য করেছে; তারা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টি সরাসরি দেখেছে? তাদের সাক্ষ্য লিখে রাখা হবে এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে। তারা আরও বলে, 'দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছে করলে আমরা এদের ইবাদাত করতাম না।' এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলছে। (সূরা যুখরুফ ৪৩ : ১৫-২০)
>
> জেনে রাখুন, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা তো এদের ইবাদাত এ জন্য করি যে, এরা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।' তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, নিশ্চয় আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না। আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছে, বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ, এক, প্রবল প্রতাপশালী। কিন্তু তিনি পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, তিনি এক, প্রবল পরাক্রান্ত। তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। রাত দিনকে ঢেকে নেয়, আর দিন ঢেকে নেয় রাতকে। সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখো, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৩-৫)
>
> আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।'

> বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও জমিনের এমন কিছুর সংবাদ দেবে, যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে...’ (সূরা ইউনুস, ১০ : ১৮)

মহান আল্লাহর সাথে জিনদের জড়িয়েও জঘন্য সব বিশ্বাস ছিল সেই সময়কার আরবদের। তারা বলত মহান আল্লাহ জিনদের থেকে স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং ফেরেশতাগণ হলেন এই ‘স্ত্রী’-দের থেকে মহান আল্লাহর সন্তান! ফলে তারা জিনদেরও ইবাদাত করত। কিতাবুল আসনাম-এ আল-কালবি বলেছেন,

> ‘খুযাআ গোত্রের বনু মালিহ শাখা জিনদের ইবাদাত করত।’[11]

এই মিথ্যা বিশ্বাসের ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

> এখন তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস করো, কন্যাগুলোই কি তোমার প্রতিপালকের জন্য, আর তাদের নিজেদের জন্য পুত্রসন্তান? নাকি আমি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল? জেনে রাখো, তারা অবশ্যই মনগড়া কথা বলে যে, ‘আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।’ আর তারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্রসন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান পছন্দ করেছেন? তোমাদের কী হলো? তোমরা কেমন ফায়সালা করছো! তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (তোমরা যা বলছো তার স্বপক্ষে) তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে? তোমরা সত্যবাদী হলে নিয়ে এসো তোমাদের কিতাব।
>
> তারা আল্লাহ ও জিনজাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জিনেরা ভালোভাবে জানে, তাদেরকেও শাস্তির জন্য অবশ্যই হাজির করা হবে। তারা (মুশরিকরা) যা আরোপ করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৪৯-১৫৯)
>
> আর স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন, তারপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, ‘এরা কি তোমাদেরই ইবাদাত করত?’ তারা (ফেরেশতারা) বলবে, ‘আপনি পবিত্র মহান, আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই জিনদের প্রতি ঈমান রাখত।’ (সূরা সাবা, ৩৪ : ৪০-৪১)

আরবের মধ্যে মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে কিছু মূর্তি ছিল ফেরেশতাদের, কিছু ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের, আর কিছু ছিল কাল্পনিক নানান দেবদেবীর। কা’বা তৈরি হয়েছিল শুধু এক আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। কিন্তু কা’বাকে তারা মূর্তি দিয়ে ভরে ফেলল। মূর্তির সংখ্যা ছিল ৩৬০। বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বেশ কিছু মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে লাত, মানাত ও উযযা নামের মূর্তির কথা কুরআনে এসেছে। আরেকটি প্রধান মূর্তির নাম ছিল হুবাল। উহুদের যুদ্ধের দিন আবূ সুফইয়ান হুবালের নামে স্লোগান দিয়ে বলেছিল,

> "হুবালের জয় হোক।"

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

> তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্পর্কে? তবে কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান? এটা তো তাহলে এক অসঙ্গত বণ্টন! এগুলো কিছু নাম মাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোনো দলীলপ্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত এসেছে।
>
> মানুষ যা চায়, তা-ই কি সে পায়? বস্তুত আখিরাত ও দুনিয়া তো আল্লাহরই। আর আসমানসমূহে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, তাদের সুপারিশ কোনোই কাজে আসবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তার ব্যাপারে

> অনুমতি দেওয়ার পর। নিশ্চয় যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নামে নামকরণ করে থাকে। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবিলায় কোনোই কাজে আসে না। (সূরা নাজম, ৫৩ : 19-28)

মূর্তিপূজা এতটা জঘন্য রূপ নিয়েছিল যে, আরবরা পাথরেরও ইবাদাত করতে শুরু করেছিল। সহীহ বুখারি-তে এসেছে, আবূ রিজা আল-উতারিদি বলেছেন,

> আমরা পাথর পূজা করতাম। যদি ওই পাথরের চেয়ে ভালো ও উন্নত পাথর পাওয়া যেত, তাহলে পুরনো পাথরটাকে ছুড়ে ফেলে নতুনটাকে গ্রহণ করা হতো। আর যদি পাথর না পাওয়া যেত, তাহলে মাটির একটি ঢিবি বানানো হতো এবং সেখানে ছাগল এনে দুধ দোহন করা হতো। এরপর তার তাওয়াফ করা হতো।[12]

কিতাবুল আসনাম-এ আল-কালবি বলেছেন,

> কোনো মুসাফির বিশ্রামের জন্য থামলে চারটা পাথর সংগ্রহ করত। এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পাথরটার পূজা করত। বাকি তিনটার ওপর রাখত খাবারের পাত্র। বিশ্রাম ছেড়ে আবার সফর শুরু করার সময় পাথরগুলো সে রেখে যেত।[13]

পারস্যবাসীদের অনুকরণে আরবরা গ্রহনক্ষত্রদেরও ইবাদাত করত। সাঈদ বলেছেন,

> হিমইয়ার গোত্র সূর্যের ইবাদাত করত। কিনানা গোত্র চাঁদের, তামিম গোত্র ওয়াবরান (রোহিনী), লাখম ও জুসাম গোত্র বৃহস্পতির, তাঈ গোত্র সুহাইল (অগস্ত্য), কাইস গোত্র শি'রা (লুব্ধক) এবং আসাদ গোত্র বুধ গ্রহের ইবাদাত করত।[14]

কুরআনের কয়েকটি আয়াতে এ বিষয়টির আলোচনা এসেছে—

> আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না, চাঁদকেও নয়; আর সাজদা করো আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন;; যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৭)

> আর তিনিই শি'রা (লুব্ধক) নক্ষত্রের রব । (সূরা নাজম, ৫৩ : ৪৯)

কুরআনের আরও বহু আয়াতে গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টির কথা এসেছে। সমগ্র সৃষ্টির ওপর মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করে গ্রহনক্ষত্রের ওপর দেবত্ব আরোপ করতে এবং তাদের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আরবদের সমাজ ও জীবনে শিরকি বিশ্বাস প্রবেশ করেছিল ব্যাপকভাবে। এসব বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল অর্থহীন নানা সংস্কার। এমন বেশ কিছু সংস্কারের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : ফসলের কিছু অংশ এবং নবজাতক কিছু পশুকে তারা তাদের দেবদেবীদের জন্য উৎসর্গ করত। এতে আল্লাহর জন্য কোনো অংশ নির্ধারণ করত না। কিছু খাবার তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। আবার কিছু খাবার হারাম ছিল শুধু নারীদের জন্য। তারা বিভিন্ন পশুর জবাই নিষিদ্ধ করেছিল, কিছু পশুর ওপর আরোহণ নিষিদ্ধ করেছিল। দেবদেবীদের খুশি করার জন্য অনেক সময় তারা তাদের পুত্রসন্তানদেরও জবাই করত। যেমনটা বর্ণিত হয়েছে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিতা আবদুল্লাহর ব্যাপারে। আবদুল মুত্তালিব শপথ করেছিলেন—তার দশম পুত্রকে দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করবেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন সেই দশম পুত্র। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহর বদলে একশ উট জবাই করা হয়। এধরনের বিষয়গুলোর নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত গণক, কবিরাজ ও জাদুকররা। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,

> আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, সে সবের মধ্য থেকে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং

নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটা আল্লাহর জন্য আর এটা আমাদের শরীকদের জন্য।' অতঃপর যা তাদের শরীকদের অংশ, তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহর অংশ, তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছায়। তারা যা ফায়সালা করে, তা কতই না নিকৃষ্ট!

আর এভাবে তাদের দেবদেবীরা বহু মুশরিকদের চোখে নিজেদের সন্তান হত্যাকে আকর্ষণীয় করে দিয়েছে, তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের দ্বীন সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তারা এসব করত না। কাজেই তাদেরকে তাদের মিথ্যা রটনা নিয়েই থাকতে দিন।

আর তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাকে ইচ্ছে করি, সে ছাড়া কেউ এসব খেতে পারবে না।' এবং কিছু সংখ্যক গবাদি পশুর পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক পশু জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না। এ সবকিছুই তারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার উদ্দেশ্যে বলে। তাদের এ মিথ্যা রটনার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাদেরকে দেবেন।

তারা আরও বলে, 'এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, আর আমাদের স্ত্রীলোকদের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু তা (অর্থাৎ গর্ভস্থিত বাচ্চা) যদি মৃত হয়, তবে সকলের তাতে অংশ আছে।'

অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কথার প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ। অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা করে আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে নিষিদ্ধ গণ্য করেছে। তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর তারা কস্মিনকালেও হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। (সূরা আনআম, ৬ : ১৩৬-১৪০)

তাওহীদ তথা; মহান আল্লাহর চূড়ান্ত একত্বের ধারণা আরবদের কাছে ছিল একেবারেই অপরিচিত। ওহি এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের ব্যাপারেও তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তবে তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত—-আল্লাহ তাআলাই আসমান, জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যেকার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এ বিশ্বাসের অবধারিত উপসংহার ও দাবিগুলো স্বীকার করতে চাইত না তারা। নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং জীবনব্যবস্থা কী হবে, কেমন হবে—তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক যে আল্লাহ, কেবল তিনিই হারাম এবং হালাল নির্ধারণ করতে পারেন, কেবল তাঁরই নির্ধারিত শারীআ দিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার ও শাসন হতে হবে—এ বিষয়গুলো তারা স্বীকার করতে চাইত না। অথচ এই বিশ্বাসগুলো ছাড়া দ্বীন এবং ঈমান;; কোনোটাই থাকতে পারে না।

আল্লাহর একত্ব ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ব্যাপারে আরবদের বিরোধিতার কথা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন :

আর তারা বিস্ময় বোধ করছে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিররা বলল, 'এ তো একজন জাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!' আর তাদের নেতারা এ বলে সরে পড়ে যে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতার ইবাদাতের ওপর অবিচল থাকো। নিশ্চয় এ বিষয়টি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এমন কথা শুনিনি; এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।' (সূরা সাদ, ৩৮ : ৪-৭)

আর কাফিররা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেবো, যে-তোমাদেরকে বলে, 'তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও নিশ্চয় তোমরা নতুনভাবে সৃজিত হবে', সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে; নাকি তার মধ্যে আছে উন্মাদনা?' না, বরং যারা আখিরাতের ওপর ঈমান আনে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৭-৮)

এই ছিল কুরআন অবতীর্ণ হবার আগে আরব উপদ্বীপের বীভৎস অবস্থা। পূর্ববর্তী নবিদের আনা শিক্ষার বিকৃত হয়ে- যাওয়া -রূপ আর জঘন্য পৌত্তলিকতা মিলে গড়ে উঠেছিল বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্বাসগত ধ্বংসস্তূপ। পূর্ব ও পশ্চিম;সব দিকেই এই আবর্জনা

ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বত্র মানুষের বিবেক পিষ্ট হচ্ছিল চিন্তার ধ্বংসস্তূপের জগদ্দল ভারের নিচে। এসব বীভৎস বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল মানুষের সমাজব্যবস্থা, আচার-আচরণ, প্রথা, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ।[15]

এজন্যই ইসলামে আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক নিয়ে সঠিক আকীদার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্বাসগুলোর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকার পরই কেবল মানুষের বিবেক মজবুত ভিত্তি পায়। পায় স্থিরতা। মানুষের জীবনব্যবস্থা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, আইন, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কগুলোও তখন পায় শক্ত, দৃঢ় ভিত্তি। মহান আল্লাহ এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে সঠিক ধারণা ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

ইসলাম বিশেষভাবে মহান আল্লাহর ওই সব বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে, যেগুলো সৃষ্টি, শাসন, রিয্ক, রক্ষণাবেক্ষণ, তাকদীর এবং মানুষের সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্কের সাথে জড়িত। কারণ মহান আল্লাহর এই বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে নানা ভুল ধারণার গোলকধাঁধায় ছিল মানুষ। অথচ মানুষের বিবেক ও জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইসলামের মাধ্যমে এই সব বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির সংশোধন করা হয়েছে। ইসলাম এসেছে সব বিকৃতধর্ম, মিথ্যাবিশ্বাস, অনুমাননির্ভর-দর্শন আর ভ্রান্ত-ধ্যানধারণা দূর করার জন্য। সেগুলোর উদ্ভব মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ের আগে হোক বা পরে। এ বিষয়টি বোঝা এবং এ নিয়ে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের এই বিস্ময়কর দিকটি এর আসমানি উৎসেরও একটি প্রমাণ। এ থেকে বোঝা যায়—ইসলাম এমন এক সত্তার কাছ থেকে এসেছে, মানবজাতির চিন্তায় ও মনে যা কিছু প্রভাব ফেলেছে এবং ফেলবে, তার কোনোকিছুই যাঁর অজানা না। তিনি সবকিছুর বাস্তবতা জানেন। অতীত ও বর্তমানের সব ভুল ও বিচ্যুতির সংশোধনের পথ তিনি দেখিয়ে দেন।

কুরআনের অনেক আয়াতে মহান আল্লাহর যাত (সত্তা) এবং সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্কের ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; বিশেষ করে মাক্কী সূরাগুলোতে। অনেকে এতে অবাক হন। কারণ তারা জানেন না—ইসলামের আবির্ভাবের আগে চিন্তার মরুপ্রান্তরে পথ হারানো, বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনা আর ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মানবজাতির অবস্থা কেমন ছিল। এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানার পরই কেবল কুরআনের উপস্থাপনা, ব্যাখ্যা এবং এতে মানুষের চিন্তা ও জীবনের সব দিক নিয়ে আলোচনা উঠে আসার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। বোঝা সম্ভব কীভাবে ইসলামের শিক্ষা মানুষকে মুক্ত করেছিল, পথ দেখিয়েছিল।

ওই সব বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনার উপস্থিতির কারণেই কুরআনে এ দিকগুলোর ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার এবং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল। কারণ যেমনটা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি—মহান আল্লাহর সত্তা, বৈশিষ্ট্য এবং সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে ধারণা মানুষের বিবেক এবং জীবনব্যবস্থার সবক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানুষের জীবন, তা ব্যক্তিগত হোক বা সামাজিক; কোনো না না ওয়ার্ল্ডভিউ বা এর পেছনে থাকা আকীদার ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে। এ কারণেই মানুষের চিন্তা, বিবেক এবং জীবনকে জাহিলিয়াতের আদর্শিক চোরাবালি আর চিন্তার শেকল থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে ঈমান এবং ইসলামি আকীদা অপরিসীম ভূমিকা রাখে। ইসলাম মানুষকে যে মুক্তি এনে দিয়েছে, জাহিলিয়াতের মরুপ্রান্তরের বাস্তবতা সম্পর্কে জানার পরই কেবল তার প্রকৃত মূল্য বোঝা সম্ভব। ইসলাম মানুষকে সুযোগ দিয়েছে অত্যাচার, নিপীড়ন, জুলুম এবং অবক্ষয় থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক আকীদার মজবুত ভিত্তির ওপর তার জীবন ও জীবনব্যবস্থাকে গড়ার। এতক্ষণ যা কিছু বলা হলো, তার সাথে দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই কথাটি মিলিয়ে দেখুন,

> ইসলামের রশি এক এক করে ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তখনই, যখন ইসলামে এমন মানুষ আসবে, যারা জাহিলিয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ।[16]

যে জাহিলিয়াতের পরিচয় পায়, সে-ই ইসলামের মূল্য বোঝে। আসমানি নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে মানবজাতির ওপর ভর করা অজ্ঞতা আর জাহিলিয়াতের ভয়ংকর বাস্তবতা সম্পর্কে যে জানে, কেবল তার পক্ষেই সম্ভব ইসলামের মূল্য এবং দ্বীন ইসলাম মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নিয়ামাত, তা অনুধাবন করা।

নিঃসন্দেহে অতীত কিংবা আধুনিক জাহিলিয়াতের বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনা আর ধ্বংসস্তূপগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দ্বীন ইসলামের সৌন্দর্য, উৎকর্ষ, ভারসাম্য, পরিপূর্ণতা এবং এই দ্বীনের মাঝে প্রোথিত গভীর কিন্তু সহজ সত্যের ব্যাপকতা মানুষ নতুন করে উপলব্ধি করে। মানুষ তখন বোঝে, সত্যিকারভাবে তার মনের গভীরে উপলব্ধি করে—এই দ্বীন হলো রাহমাহ। মানুষের মন ও মস্তিষ্কের জন্য রাহমাহ। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য রাহমাহ। সৌন্দর্য ও সরলতা, স্পষ্টতা ও ভারসাম্য, জীবনঘনিষ্ঠতা এবং মানবপ্রকৃতির সাথে সঙ্গতি—সব দিক থেকেই ইসলাম মানবজাতির জন্য রাহমাহ।

নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সত্য বলেছেন,

> যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখের ওপর ভর দিয়ে চলে, সে কি অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (সূরা মুলক, ৬৭ : ২২)

---

[1] সকল বঙ্গানুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে বাইবেল বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে। (অনুবাদক)

[2] নেফিলিম : হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত রহস্যময় জাতি। বাইবেলের বক্তব্য অনুসারে 'ঈশ্বরের পুত্র' আর 'মনুষ্য নারী'দের মিলনে নেফিলীমদের জন্ম। অনেকে নেফিলিম-কে 'giants' বা 'দানব' হিসেবে অনুবাদ করেছেন। ইয়াহূদি ব্যাখ্যাকারদের অনেকে মনে করে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলতে বোঝানো হয়েছে ফেরেশতাদের একটি দলকে। যেমনটা সাইয়্যিদ কুতুব (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এসব গালগল্পের সাথে ওহির শিক্ষার চেয়ে পৌরাণিক পৌত্তলিকতার মিল বেশি। (অনুবাদক)

[3] জন উইলিয়াম ড্র্যাইপার, History of the Conflict Between Religion and Science (১৮৭৪), পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫।

[4] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০।

[5] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০-৪১।

[6] মনোফিসাইট (Monophysites) 'একপ্রকৃতিবাদী' খ্রিষ্টধর্মের প্রাচীন একটি ফিরকা। মেলকাইট (Melkites) খ্রিষ্টধর্মের আরেকটি ধারা। এদেরকে আরবিতে 'মালকানি' (مَلْكَانِيُّوْنَ) বলে অভিহিত করা হয়। মেলকাইট বা মালকানিরা মনে করত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃতি মিশ্রিত। এক অংশ খোদায়ী, আরেক অংশ মানুষের। এটা ছিল সে সময়কার সরকারি মত। মনোফিসাইট বা 'একপ্রকৃতিবাদী'রা মনে করত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃতি একটিই এবং সেটা নির্ভেজাল খোদায়ী। (অনুবাদক)

[7] অ্যালফ্রেড টি বাটলার, The Arab Conquest of Egypt, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৮), পৃষ্ঠা 29।

[8] ওসাইরিস (Osiris), আইসিস (Isis) ও হোরাস (Horus) ÷ প্রাচীন মিশরীয় পৌত্তলিক ধর্মের তিন দেবদেবী। ওসাইরিস পরকাল, পাতাল আর মৃতদের দেবতা। আইসিস মাতৃত্ব, উর্বরতা এবং জাদুবিদ্যার দেবী। হোরাস আকাশ আর যুদ্ধের দেবতা। তাকে মনে করা হতো রাজত্ব ও ফিরআউনদের রক্ষাকর্তা। মিশরীয় পুরাণ অনুসারে, ওসাইরিস ছিলেন আইসিসের ভাই এবং স্বামী। হোরাস তাদের পুত্র। ওসাইরিসকে তার ভাই সেট (Set) হত্যা করে, কিন্তু আইসিস তার জাদুকরী ক্ষমতা ব্যবহার করে জীবিত করে তোলে ওসাইরিসকে। হোরাস তারপর সেটকে যুদ্ধে পরাজিত করে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। খ্রিষ্টবাদের প্রচারিত ত্রিত্ববাদ বা ট্রিনিটির ধারণার সাথে মিশরীয় এ ট্রিনিটির মৃত্যু ও পুনর্জীবনের থিমসহ বেশ কিছু মিল চোখে পড়ার মতো। (অনুবাদক)

[9] I. A. Dorner: A System of Christian Doctrine, vol. iii, pp. 215.216. (London, 1885). J. C. Robertson: History of the Christian Church, vol. ii, p. 226. (London 1875)।

[10] টি ডব্লিউ আরনল্ড, The Preaching of Islam (১৯১৩), পৃষ্ঠা ৫২-৫৪।

[11] আল-কালবি, কিতাবুল আসনাম, পৃষ্ঠা ৩৪।

[12] বুখারি, ৪৩৭৬।

[13] আল-কালবি, কিতাবুল আসনাম, পৃষ্ঠা ৩৪।

[14] তবাকাতুল উমাম, পৃষ্ঠা ৪৩০।

[15] ইসলাম আবির্ভাবের পর গড়ে -ওঠা -ওয়ার্ল্ডভিউ, দর্শন এবং ধর্মগুলোর অবস্থা; বিশেষ করে যেসব চিন্তা ও দর্শনের ভিতের ওপর পশ্চিমা চিন্তা ও জীবনধারা গড়ে উঠেছে—অতীতের জাহিলিয়াতের চেয়ে ভালো বলা যায় না। এ নিয়ে সামনের অধ্যায়গুলোতে আমরা কিছুটা আলোচনা করব।

[16] বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ভুমিকা, পৃষ্ঠা, ৬৯।